গোধূলীর গান -২

হিফজুর রহমান

গত হপ্তায় লেখা হয়নি প্রচন্ড পেশগত কাজের ব্যস্তার কারণে। মনটা খারাপ ছিল সেজন্যে। দেশটা আবার পড়ে গেল হরতালের খপ্পরে। যারা হরতাল ডাকেন, তারা বলেন-জনগন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতালে সাড়া দিয়েছে। অবশ্য এজন্যে তাদের হরতালের আগের দিন বেশ ক'টি বাস, গাড়িতে আগুন লাগাতে হয়েছিল। হরতালকারীদের একবার বলতে ইচ্ছে হয়, একবার বলুন না হরতার চলাকালে সবাইকে নির্ভয়ে চলতে দেয়া হবে, কাউকেই কোন কাজে বাধা দেয়া হবে না, তাহলে একবার দেখুন জনসাধারণের কাছ থেকে কি জবাব আপনারা পান। মনটা এসব কারণে বড়োই বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। তারপরও জীবন চলে, চলতে হয়।

অথঃ কলামিস্ট সমাচার

বাংলাদেশে এখন পত্রিকা অনেক। স্বাভাবিকভাবেই সাংবাদিক অনেক এবং কলামিস্টও অনেক। অনেকের লেখা প্রচন্ডভাবে আকর্ষণ করে, ফলে সময় খুব কম থাকলেও সেই লেখাটা পড়ে ফেলার চেষ্টা করি। তবে মজার অনেক ঘটনাও আছে আমার অতীত জীবনের। তখন আমি সদ্য দৈনিক বাংলার বাণী'র সিনিয়র সহ-সম্পাদক এবং তার ক'দিন পরেই নিউজের শিফট-ইন-চার্জ। বাংলার বাণীর সম্পাদক শেখ সেলিম আমার হাতে একটি ছেলেকে গছিয়ে দিয়ে গেলেন। তার নাম বলবোনা। শুধু বললেন. "হিজবুর (উনি আমাকে জীবনেও হিফজুর বলে ডাকরেত পারেননি) এই ছেলেটাকে একটু মানুষ বানাও। সেও ১৯৮২ সালের কথা। সাংবাদিকতা ছেড়ে দেবার পর একসময় জানলাম সে এখন একজন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং অন্যতম বৃহৎ পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার। খুশীই হয়েছিলাম শুনে। অস্ট্রেলীয় দুতাবাসে থাকাকালে প্রতিদিন সবক'টা খবরের কাগজ পড়াও ছিল আমার একটি দায়িত্ব। মন্দ লাগতোনা, সকালে এক মগ কালো কফি পান করতে করতে পত্রিকাগুলো পড়ে ফেলতাম। একদিন সেই বিখ্যাত সাংবাদিকের নামে ছাপা একটা নিউজ দেখে আগ্রহী হয়ে পড়তে লাগলাম। একসময় দেখি, সে লিখেছে-অজিজ মোহাম্মদ ভাইকে নিসান পাজেরো গাড়িতে করে সিআইডি অফিসে নেয়া হয়েছিল। অবাক হলাম। না পেরে ওকে ফোন করেই বসলাম, আচ্ছা একজন মানুষকে একসাথে দু'টো গাড়িতে করে কিভাবে নিলেন সিআইডি অফিসে? সেও অবাক। বললো, বাবুল ভাই কি ভুল করলাম! আমি বললাম আপনি কি এও জানেন না যে নিসান ও পাজেরো দুই কোম্পানীর দু'টো গাড়ি! সে একটু লজ্জাই পেয়েছিল, নির্লজ্জ হয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। এরকম উদাহরণ হাজারো পাওয়া যাবে এখনকার সংবাদপত্র ঘাঁটলে। যাকগে সেসব কথা।

'ছিঁটে ফোঁটা' কোন সময় হাতে পেলে লং-ড্রাইভে ডালিয়া ও আমি প্রায়ই ছুটে যেতাম, গাজীপুর শালবন বিহার,জুলাই ১৯৯৯

ক'দিন আগেই অস্ট্রেলিয়া প্রকাশিত নাকি প্রচারিত একটি

আন্তর্জাল (বনির কাছ থেকে শিখেছি) ম্যাগাজিনে নতুন এক কলামিস্টের আগমন ঘোষণা হলো সাড়ম্বরে। তার নাম ডালিয়া নিলুফার। তাকে চিনি আমি অনেকদিন থেকেই। বিশেষ করে প্রায় চার বছর ধরে নিগূঢ়ভাবেই চিনতাম (১৯৯৯-২০০২)। অত্যন্ত মননশীল ও সৃষ্টিশীল মানুষ তিনি। গান গাইতে জানেন, অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালে পিয়ানো বাজিয়েও জীবন-যাপন করেছেন। ঢাকায় থাকতে একটি কম্পিউটার কোম্পানীর সেলস অফিসার ছিলেন, আর তার স্বামী ছিলেন হোটেলিয়ার। আসলে ডালিয়ার গুনের কোনই কমতি নেই। অস্ট্রেলিয়ায় থাকতেও কখনো কখনো নিদারুণ সব লেখা লিখতে যা অনেককেই আকৃষ্ট করতো, আমাকেও। কারণ, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম বলে তার লেখার পেছনের মানুষটাকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করতাম, অনেক সময় পেতাম না। কেন পেতাম না সেটা নাহয় বারান্তরে বলা যাবে। তবে তাকে বাংলাদেশে কখনো কলামিস্ট হিসেবে পাঠ করার সুযোগ হয়নি, হয়তো ভবিষ্যতে হবে। যেখানেই হোকনা কেন, বিশিষ্ট কলামিস্ট হিসেবে তার আগমনকে শুভেচ্ছা জানাতেই হয়। আমি নিশ্চিত, তিনি তার বিশিষ্ট চিন্তা দিয়ে আমাদের অনেক ঋদ্ধ করবেন ভবিষ্যতে।

এক লেখকের জন্ম ও সেবা প্রকাশনী

বাংলার বাণীতে যোগ দেবার পর মাত্র একমাস একসাথে বেতন পেয়েছিলাম। তারপর থেকে একেবারেই নয়ছয় অবস্থা। একবেলা খাবার জোটেতো আরেকবেলা জোটেনা। একটু ঘাবড়েই গেলাম। কি করা যায় ভাবছি। এমন সময় পাশা ভাই (রশিদুল হক পাশা-আমার সিনিয়র সহকর্মী) বললেন, বাবুল ক্ষ্যাপ মারবেন? সংবাদপত্রে অন্য কোথাও খন্ডকালীন কাজ করাকে ক্ষ্যাপ মারা বলা হতো। পাশা ভাইয়ের প্রস্তাব হলো, উইকলি হেরাল্ডের খেলাধুলার পাতাটা করে দিতে হবে এবং এজন্যে দেবেন পাঁচশ টাকা। আমিতো খুশীতে বাগবাগ। বাসা ভাড়ার একটা সুরাহা হয় তাহলে। হেরাল্ডের পেমেন্ট আবার সময়মতোই হতো। ওই কাজটা পাবার পর মনে হলো আর একটা কাজ পেলে মেটামুটি বেঁচে থাকার সংস্থান হয়ে যেতো।

ছোটবেলা থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই পড়তাম। বিশেষ করে মাসুদ রানা, কারণ তাতে নিষিদ্ধ একটা আবরণ থাকতো। সেই থেকেই ভক্ত কাজি আনোয়ার হোসেনের। একদিন সাহস করেই ফোন করে বসলাম তাকে। বললাম, আমি বাংলার বাণীর সিনিয়র সহ-সম্পাদক। আমি আপনার ওখানে কাজ করতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে-পরশু সকাল ন'টায় চলে আসুন। আমি সেবা প্রকাশনী চিনতামনা। যাই হোক, বইয়ের পিঠের ঠিকানা ধরে সময়মতো পৌঁছুবার জন্যে অনেক আগেই গোপীবাগের বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম, নাশতা না করেই। পৌঁছে গেলাম সকাল আটটায়। এখন কি করা? সেগুনবাগিচাতেই চিটাগায় রেস্তোরাঁ নামে একটি প্রায়গন রেস্তোরাঁ আছে। তাতে সাহস করে ঢাকলাম পকেটের অনেক হিসেব করে। দু'টো পরোটা আর এক পিরিচ ডাল খেলাম, বেশ ধীরেই। কারণ, আমার হাতে সময় অনেক। তাও কতোক্ষণ? একটু পরে উঠে ধীরে ধীরে উঠে সেবা প্রকাশনীর দিকে এগোলাম। ঠিক ন'টার সময় ঢুকলাম সেবা প্রকাশনীর একতলার ঘরটিতে। সামনেই বেশ গুরুগম্ভীর একজনকে দেখলাম নাকের আগায় রিডিং গ্লাস লাগিয়ে মনোযোগের সাথে কি যেন পড়ছেন। মাথার চুল কাঁচাপাকা। ভাবলাম ইনি কাজী আনোয়ার না হয়েই যাননা। তাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সালাম জানিয়ে বললাম, কাজীদার সাথে আমার দেখা করার কথা ন'টার সময়। উনি চট করে উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি হিফজুর রহমান? আমি বললাম, জ্বী। তখন একজনকে ডেকে বললেন, এই ওনাকে বড়দার ওখানে নিয়ে যাও। পরে জানতে পেরেছিলাম, উনি সেবা'র জেনারেল ম্যানেজার, আবদুল কুদ্দস।

দুরু দুরু বক্ষে আমার পথনির্দেশকের পিছু নিয়ে চললাম একটু ঘুর পথে। তার পর একটা পুরনো বাড়ির দোতলায় উঠে একেবারে শেষ ঘরটার দরজা খুলে আবার পথপ্রদর্শক কাউকে বললেন, স্যার, হিফজুর রহমান সাহেব এসেছেন। উনি সম্ভবতঃ আমাকে ভেতরে ঢোকার নির্দেশ দিলেন। একজুন মানুষ একটা ডেস্কের পেছনে। পুরো অবয়ব জুড়ে কেবলই বুদ্ধির ছায়া। ঘর ভর্তি কেবল বই আর বই। উনি দাঁড়িয়েই ছিলেন। আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকে সালাম জানালাম। অবাক হলাম, এই সেই কাজীদা, বোধহয় যার কথা স্বপ্নেও বুনতাম। তিনি অত্যন্ত নরোম স্বরে আমাকে বসতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গেই কাজের কথা। তিনি বললেন, 'আমাদের এখানে প্রুফ দেখার কাজ আছে। তাতে আমরা প্রতি পৃষ্ঠা ছয় টাকা করে দিয়ে থাকি।'

তার কথা শেষ হবার আগেই অভিমানে অপমানে আমার বুকটা উথলে উঠলো। কোনরকমে বললাম, 'কাজীদা আপনার এখানে প্রুফ দেখার কাজ পেতে আসিনি। আসলে আমি এসেছি, লেখালিখির সুযোগ পাবার জন্যে। কারণ, ছোট্ট বেলা থেকেই আমি সেবার একজন পাঠক।'

কাজীদা একটু বিড়ম্বিতই হলেন মনে হলো। সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার অনুদিত কোন কিছু কি আছে যা দেখে আমি বুঝতে পারবো যে, আপনাকে দিয়ে আমাদের চলবে কি না?'

আমার সদ্য অনুদিত "লেনিনগ্রাদ অবরোধের নয়শো দিন"-এর ক্লিপিংগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম, ফাইল বন্ধ করে। কম্পিত হাতে তার হাতে দিলাম সেটা। এর মধ্যে চা-বিস্কিট এলো। চারটা বিস্কিটের মধ্যে দু'টো উনি তুলে নিলেন তার চায়ের প্লেটে। আর বাকি দু'টো আমার জন্যে ছেড়ে দিলেন। একেবারে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা! উনি মনোযোগের সাথে পৃষ্ঠার পর পৃষ্টা পড়ে যাচ্ছেন আর আমি তার মুখভঙ্গী দেখে তার মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছি। একসময় তিনি থামলেন। ফাইলটা দিলেন আমার দিকে বাড়িয়ে। আমি ভাবলাম কম্মোকাবার। কিন্তু, কাজীদা তার চেয়ার ছেড়ে উঠে একটা আলমারির ভেতর থেকে একটা ইংরেজী বই বের করে এনে আমার হাতে দিলেন। বইটার নাম "পজাইডন অ্যাডভেঞ্চার"।

কাজীদা বললেন, 'এই বইটার প্রথম পরিচ্ছেদটা অনুবাদ করে আনুন, তবে ভাষানুবাদ নয়, ভাবানুবাদ।" আমিতো ভেতরে দারুণ উৎফুল্ল। বেড়ালের ভাগ্যে বুঝি শিকে ছিঁড়লো!

উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে আনতে পারবেন?' আমি বললাম, 'পরশু'। ঠিক আছে, পরশু সকাল ঠিক ন'টায় আবার, কেমন?'

আবার সেবা প্রকাশনী, সকাল ন'টায়। জেনারেল ম্যানেজার এবার বললেন, 'চলে যান, বড়দা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' আবারো দুরু দুরু বক্ষে ঢুকলাম তার কক্ষে। খুশী হলেন, 'একেবারে সময়মতো! গুড।'

তারপর তার হাতে অনুদিত অংশটুকু দিলাম। যথারীতি চা-বিস্কিট এলো এবং তিনিও যথারীতি দু'টি বিস্কিট তুলে নিলেন নিজের জন্যে, বাকী দুটো পড়ে রইল আমার জন্যে। পড়তে লাগলেন আমার উৎপাদন! দেখছি একটি গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন পড়তে পড়তে। আমি মনে মনে পালাবার চিন্তা করতে লাগলাম। এমন সময় কাজীদা বললেন, 'হিফজুর, আপনার চরিত্রগুলো যেন রক্তমাংসের নয়। অনেকটা পিনোক্কিওর মতো, কাঠের মানুষ।' তারপর তিনি আমার অনুবাদের কিয়দংশ পড়ে পড়ে ভুল কোথায় ধরাতে লাগলেন এবং কি হওয়া উচত সেটাও বলতে লাগলেন। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি পারবেন?' আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলাম, 'পারবো কাজীদা।' উনি আবারো বইটার প্রথম পরিচ্ছেদ অনুবাদ করে আনতে বললেন দু'দিন পর।

হেরে যাওয়া আমার চরিত্রের মধ্যে কখনোই ছিলোনা। ফলে উঠে পড়ে লাগলাম এবং আবার অনুবাদ নিয়ে দেখা করলাম। তিনিও আগের মতেই পড়তে শুরু করলেন চা-বিস্কিট সহযোগে। মুখের ভাব দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। সবটা পড়ে কাজীদা বললেন, 'এবার পুরোটা অনুবাদ করে ফেলুন। অসুবিধে নেই।' ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল।

প্রায় এক ছুট্টেই চলে এলাম বাসায়। শুরু হয়ে গেল আমার রচনা। বাংলার বাণীতে আমার ডিউটি থাকতো রাতের শিফটে। দিনের বেলায় মেঝেতে উপুড় হয়ে লিখে চলতাম (আমার বাসায় তখন কোন টেবিল চেয়ার ছিলনা, পরে অবশ্য মুগদাপাড়া থেকে আমকাঠের টেবিল আর চেয়ার কিনেছিলাম তিনশ টাকা দিয়ে)। একমাসের মধ্যে লেখা শেষ করে কাজীদার কাছে পৌঁছে দিলাম। কাজীদা জানালেন, তাঁর একটি সম্পাদনা পুল আছে, তাদের কাছে আমার স্ক্রিপ্টটা পাঠানো হবে। তাতে আমার কোন আপত্তি আছে কি না? আমি বললাম কোন আপত্তি নেই। তারপর আমি চলে গেলাম।

প্রায় ১৫ দিন পর সেবা থেকে কুদ্দুস সাহেব আমাকে জানালেন আপনার বই কম্পোজ শুরু হয়ে গেছে। চতুর্থ প্রুফটা দেখতে আপনাকে পাঁচ ভাই ঘাট লেনে (দোলাই খাল) আজ বিকেলে যেতে হবে। আমি জীবনেও ওই জায়গার নাম শুনিনি জীবনেও। তারপরও না বলার তো কোন সাহস নেই! সেদিন আবার ঝুম বৃষ্টি। একটা রিকশা করে চললাম। দোলাই খাল গিয়ে রিকশাওয়ালা বললো, 'অমি আর যাইতে পারতাম না।' ওকেই বা কি দোষ দেবো! রাস্তায় তখন হাঁটু জল। আর ওরতো প্রুফ দেখার তাড়া নেই, আমার আছে। শেষ পর্যন্ত লোকজনকে জিজ্ঞেস করে পৌঁছুলাম আমার সেই আরাধ্য জায়গায়। তখন হ্যান্ড কাস্টিং টাইপে কম্পোজ হতো। দেখলাম, বেশ ক'জন লোক টিমটিমে আলোর মধ্যে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে যাচ্ছেন একমনে। সেবার জেনারেল ম্যানেজার কুদ্দুস ভাইও ছিলেন সেখানে। তিনি ঘোষণা দিলেন, 'কোন চিন্তা নাই লেখক চলে এসেছেন।' তবে অআমার হাঁটু পর্যন্ত কাদামাখা দেখে তিনি যারপরনাই দুঃখিত হলেন। যাই হোক চা খেতে খেতে প্রুফ দেখা শুরু করলাম। স্বস্তি পেলাম, খুব বেশি সম্পাদনার প্রয়োজন হয়নি। এভাবে প্রুফ দেখাও শেষ হলো একদিন।

তারপর অপেক্ষা কবে বই বের হয়! একদিন সকালে ইত্তেফাক পত্রিকায় দেখি বিজ্ঞাপন। "নতুন লেখক হিফজুর রহমানের রোমাঞ্চোপন্যাস "ধূসর দেয়াল"। দৌড়ে গেলাম বায়তুল মোকাররম। দেখলাম বইয়ের স্টলগুলোতে অনেক বইয়ের সাথে আমার লেখা বইটিও শোভা পাচ্ছে। আনন্দে একটা বিশাল লাফ দেবার কথা ভাবলেও ওটা পাগলামি হবে বলে বাদ দিলাম। তবে নিজের বই নিজেই ১২ টাকা দিয়ে কিনে একগাদা খুশি নিয়ে বাসায় এলাম। সবাই খুব খুশি। ওই সময় আমার সাথে আমার স্ত্রীর বড়ো ভাইও থাকতেন, নইলে আমার একার পক্ষে বাসা নিয়ে থাকা সম্ভব হতোনা। সম্মন্ধি বললেন, 'মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু!' মনটা কালো হয়ে গেল। যা টাকা ছিল, তাই দিয়েইতো বইটা কিনে এনেছিলাম। পকেট তখন শূন্য। কাল কিভাবে চলবো জানিনা। আমার সম্মন্ধি শাহিন বুঝলেন আমার অবস্থা। আমাকে বললেন, 'চলেন, ওঠেন আমার মোটর সাইকেলে।' কিছু না বুঝেই উঠলাম তার মোটর বাইকে। একটানে উনি চললেন গুলিস্তানের পেছেনে। ওখানে বেশ ক'টা বিরিয়ানির দোকান। শাহিন একটা দোকানে ঢুকে প্রত্যোকের জন্যে হাফ প্যাকেট বিরিয়ানি কিনলেন, দাম তখন ১২ টাকা। সেই ছিল পরমানন্দ। অনেক অনেক কষ্টের মধ্যে সেই দিনটির কথা ভুলতে পারিনা কখনো।

তারপর একে একে বেরোল অতল প্রলোভন, শিকারী আরো কতো কি? ২৯টা বই লেখা হয়ে গেছে বাংলা ও ইংরেজী মিলিয়ে। অস্ট্রেলীয় দুতাবাসের নিষেধাজ্ঞা না থাকলে এই সংখ্যা হয়তো

আরো বেশি হতো, কে জানে! কিন্তু, এক লেখকের জন্ম হলো সেবা প্রকাশনীর হাত ধরে, যতোই উচ্চিংড়ে লেখকই হইনা কেন?

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ০৮/০৭/২০১১, ইমেইল # hifzur@dhaka.net

হিফজুর রহমানের আগের লেখাটি পড়তে এখানে টোকামারুন